IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

লাঠি খেলার সেকাল ও একাল

Lathi Khelar sekal o ekal

Khairul Basar

M.A in History (Netaji Open University),

West Bengal

ABSTRACT : Used in stick games, Lathi is a Prakrit word derived from the Sanskrit word 'farm yasti'. Stick games can be called stick tricks. Lathi playing is a traditional Martial Arts, one of the oldest Martial Arts in the world. Lathi playing is now followed only on religious occasions such as Muharram and Ram Navami. The game is generally followed in India and Bangladesh nowadays, Lathi game is a type of fighting with sticks and the skilled players were called Lathial and Barkandaz. Lathi game has come in modern times and it has become a recreational game in a religious ceremony. Because in medieval India this stick game was a means of showing valor and bravery of Bengali and Indian heroes. During the Indian independence war, this stick game was followed to create nationalistic spirit and fighting spirit. And the Hindu Mela of Navgopal Mitra, Mitra Mela of Vinayi Sabhakar and Ganesh Sabhakar, Dhaka Practice Association of Pulin Bihari Das played the most significant role in teaching this stick game. Deepali Sangh and Mahila Rashtra Sangh were established to make women physically strong and mentally strong. Therefore, the main purpose of my writing is to not think of stick game as just an entertainment aspect, and forget about communalism and use it as a part of character building. In today's society, especially if women are taught to use all types of weapons used in this game, then women nowadays I think it will be possible to eliminate the constant victimization and they will be able to protect themselves.

Kye words: Barkandaz, Hazrat Muhammad, Sriram, Akhara, Pritilata Waddedar.

Reference Book

1- Kumar Gangopadhyay, Dilip (In Search of India-History), 1 vol July, 2018

2- Haider, Zia – (Theatre Katha) 29, November 2020

3- Lathial -Wikipidia

4- Kumar Mukhopadhyay, Subodh – (Modern Bharatpalashi to Nehru 1757-1964) January, 2011

5- Titumir–Wikipidia

6- Battle of Karbala -Wikipidia

লাঠিখেলার উদ্ভবকবে, কখন,কোথায়, এবং কীভাবে হয়েছে তার ইতিহাস জানা বড়ই দূরহ ব্যাপার।তবে,সভ্যতার সূচনাকাল থেকে মানুষ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে , কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে নানান হাতিয়ার ব্যাবহার করা শুরু করেছিল, তা আমাদের কাছে অজানা কোন বিষয় নয়। মানুষ যখন স্থায়ী বসতি স্থাপন করেনি, সেই প্রস্তরযুগ থেকে নানারকমের পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু করে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে হাতিয়ারের পরিবর্তন উল্লেখ্য। সেই সূত্রে মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিংবা খাদ্যের তাগিদে নানা রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করে চলেছে। আমরা যদি প্রাচীন পর্বের ইতিহাস ভালোভাবে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাবো প্রস্তর যুগে মানুষেরা নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে নানা রকমের পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন।

প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শনাদিথেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন যুগে মানুষেরা প্রধানত কোয়ার্টজাইট পাথর দিয়ে হাত কুড়াল তৈরি করত,"এই ধরনের হাত কুড়াল সর্বপ্রথম ফ্রান্সের সেন্টএ্যাসুলগ্রামে পাওয়াযায়।আর ভারতের মধ্যপ্রদেশের রায়সেন জেলার ভিমবেটকা এই উপপর্বের এক গুরুত্বপূর্ন প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার একটি শিলাশ্রেয়ে, হাতকুড়াল ও কোপানি আবিষ্কৃত হয়েছে"[1]।

এর থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার অনাদিকাল থেকে করে আসেছে সেটা হোক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিংবা খাদ্যের অনুসন্ধানে। উল্লেখিত যে, সেকালের হাত কুড়ালের আধুনিক রূপ লাঠি খেলার ব্যবহৃত ফর্সা হতে পারে। কারণ দুটোই হাতিয়ারের গঠনগত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে দুটোরই প্রায় মিল রয়েছে। যেমন –দুটোতেই কাঠের গুড়ির হ্যান্ডেলের ব্যবহার করা হতো,দুটোরই মাথার দিকে ধারালো পাথর কিংবা ধাতুর ব্যবহার করা হতো।

আবার প্রাচীনকালে মানুষ যেহেতু, পশু ও পাখি শিকার করতো,ফলমূল সংগ্রহ করত এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত তাই সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে তারা খাদ্যের সন্ধানে তাঁরা বিভিন্ন পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, অরণ্য, সমতল ভূমি সর্বত্র জায়গা ঘুরে বেড়াতো। এই প্রাচীনকালে যে মানুষ খাদ্য সন্ধানে ও শিকারের জন্য ঘুরে বেড়াতো সেটা ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ তাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিকারের খোঁজ নয়,বরং শিকারি প্রাণী থেকে নিজেদের জীবন রক্ষাও করতে হতো। যার জন্য তারা ব্যবহার করত নানা ধরনের ধারালো হাতিয়ার সেগুলির মধ্যে অনেকগুলির হাতিয়ারের ব্যবহার বর্তমান সময়ে লাঠি খেলার অনুষ্ঠানেও ব্যবহার করাহয়। যেমন লাঠি,ঢাল,বর্শা,বল্লম ও ফর্সা ইত্যাদির ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য আছে যে পশু পাখি শিকার করার আগে ও পড়ে আয়োজন হতো এক পশু শিকার সম্পর্কিত নৃত্যে ও উৎসবের।"সেসব নিত্য ও উৎসব কালে অনেক মানুষ পশুর চামড়া, মাথা শিং লেজ ইত্যাদি পরিধানপূর্বক শিকার সজ্জিত হত এবং আরো কিছু জন শিকারি সাজেসজ্জিত হত এবং শিকারকার্যের অভিনয় করতো"।[২] উক্ত প্রাচীন যুগের আদিবাসীদের শিকার কার্যের এইলকনৃত্যে বা নাটকে লাঠি,তীর, বল্লম,ফর্সা, প্রভৃতির ব্যবহার থাকলেও থাকতে পারে। কারণ তারা পুরোপুরি শিকার ও শিকারীর অভিনয় করত তাহলে তো সহজে অনুমেয়যে,লাঠির ব্যবহার যদি উক্ত লোকো নৃত্যে না থাকলেও, বল্লম, ফর্সা, তীর, ধনুক ও বর্শার ব্যবহারকরা হতো এতে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচিত সকল প্রকার হাতিয়ারের ব্যবহার যে আদিকাল থেকে হয়ে আসতেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বল্লম,ফর্সা, ঢাল, ও বর্ষার ব্যবহার বর্তমান যুগের লাঠি খেলার দলগুলি বা লাঠিয়ালের দলগুলি এখনো ব্যবহার করে চলেছে। সেহেতু এই ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট যে আদিকালের লকনৃত্য কালবিবর্তনের মধ্য দিয়েসময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানের ধার্মিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

মানুষ যাযাবর জীবন শেষে বসতি স্থাপন শুরু করে, সেই সাথে সাথে মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নানা রকম আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করে।কারণ মানুষ যখন যাযাবর জীবন যাপন করত তখন শুধুমাত্র তাদেরকে পশু শিকার করতে হত ও শিকারি পশু থেকে নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ারের ব্যবহার করতে হতো। কিন্তু মানুষ যখন যাযাবর জীবন ত্যাগ করে বিভিন্ন কাবিলা বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় তখন সেই গোষ্ঠীগুলির বা জাতিগুলির প্রয়োজন হয় অন্য গোষ্ঠী থেকে নিজেদের মজুদ করা দানা শস্য থেকে শুরু করে সব কিছুকে রক্ষা করা। আর রক্ষা করতে এগিয়ে আসে সেই জনগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ ও হাতিয়ার চালাতে পটু লোকেরা।এবং তারা নিজেদের পরবর্তী পরজন্মকে সেই যুদ্ধবিদ্যা শেখাতেন।এইভাবেই সম্ভবত জন্ম নিল আজকের যুগের লাঠি খেলা। কারণ, তারা প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করতেন সম্ভবত লাঠি, তীর, বল্লম, ফর্সা, ঢাল, ও তলোয়ার বিভিন্ন হাতিয়ারের। হাতিয়ার চালাতে তাদেরকে দক্ষ করে তোলা হত। প্রায় এইসকল হাতিয়ারেরই ব্যবহার বর্তমান যুগের লাঠি খেলায় দেখা যায়।

লাঠি খেলায় ব্যবহৃত হাতিয়ার গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

1. লাঠি : পাকা বাঁশের নিচের শক্ত গড়ালি থেকে তৈরি করা হতো, এর দৈর্ঘ্য হত ব্যবহারকারীর সমান কিংবা তার থেকে মোটামুটি এক ফিট লম্বা বা খাটো, ব্যবহারকারী সুবিধা অনুসারে।

2. বল্লম:বল্লম লাঠির মতো একই ভাবে প্রস্তুত করা হতো। বাসের গোড়ালি কেটে জলে ডুবিয়ে, রৌদ্রে পুরিয়ে, এবং তেল মাখিয়ে এসব লাঠি প্রস্তুত করা হতো, ও ব্যবহার করে এর সুবিধা মত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ হত এবং উপরের অংশের থাকতো ধারালো ও ত্রিশূল এর মত সূচালো ধাতব হাতিয়ার লাগানো।

3. ফর্সা :ফর্সা হচ্ছে কোন বাঁশের বা গাছের ডালে এর থেকে দেড় হাত লম্বা হাতলযুক্ত একটি অস্ত্র এবং এই হাতলের আগার দিকে যুক্ত থাকতো একটু ধনুকের নেয় দেখানো ধাতব অস্ত্র।

4. তলোয়ারি : এই অস্ত্রটির সঙ্গে কম বেশি আমরা সকলে পরিচিত। এটি হচ্ছে কাঠের হাতলযুক্ত লোহা বা স্টিলের তৈরি ধারালো হাতিয়ার।যাঁর একদিকে তোরতোরে মসৃন ধার থাকতো, যেটা দিয়ে খুব সহজেই কারোর শিরচ্ছেদ করা যেত।

5. ঢাল :ঢালের কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে ব্যবহারকারীকে সুরক্ষিত রাখা, এটি একটি বড় খালার নেই হাতলযুক্ত একটি রক্ষন অস্ত্র।

6. ছোটছুরি: এই অস্ত্রটির কাজহচ্ছে কাছের প্রতিপক্ষ কে আঘাত করা, এর আকার বেশী বড় হয় না, এটা বলতে পারি তলোয়ারের ছোট রূপ।এছাড়াও লাঠি খেলায় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঢলক, তাসা, কর্নেট, ঝুমঝুমি ও হুইসেল ইত্যাদি।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানব সমাজ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, এবং সকল প্রকার হাতিয়ার এর ব্যবহার জীবন যাপনের প্রয়োজনে ভাবনাকে ছাপিয়ে নৃত্য ও বিনোদন মূলক খেলা কিংবা শারীরিক গঠনগত ও মানসিক বিকাশের ব্যায়াম হিসাবে জন সমাজে পরিচিতি লাভ করে।

এই লাঠি খেলার সাথে দক্ষিণ ভারতের ‘কালারিপায়াত্তু’ নামক দক্ষিণ ভারতীয় মার্শাল আর্ট এর মিল দেখতে পায়। কালারিপায়াত্তু হল একটি মার্শাল আর্ট যা, এগারো –বারো শতকের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত ও বিকশিত হয়। কিংবদন্তি অনুসারে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম শিবের কাছ থেকে এই শিল্পকলাটি শিখেছিল। এবং কেরালার অধিবাসীদের এই প্রতিরক্ষা মূলক কলার জ্ঞান দিয়েছিলেন।এই কালারিপায়াত্তু ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র

সঙ্গেবর্তমান লাঠি খেলায় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের অনেকখানি মিল রয়েছে। যেমন এই কালারিপায়াত্তুতে ব্যবহার করা হতো,বর্শা,তলোয়ার, ঢাল, এবংতীরধনুক। যা বর্তমান লাঠি খেলাতে আজও ব্যবহার করা হয়। তাই এটা খুব সহজেই অনুমেয়ও যে দক্ষিণ ভারতের মার্শাল আর্টের সাথে বাঙ্গালী মার্শাল আর্ট বা লাঠি খেলার অনেকখানি মিল রয়েছে।

লাঠি প্রাচীন যুগে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও,মধ্যযুগে এসে লাঠি খেলার উদ্ভব সামন্ত ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লেখ্য যে যারা ভালো লাঠির উপর নিয়ন্ত্রণ আনতো এবং বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণের কৌশল দেখাতো তাদের এক শ্রেণীর 'লাঠিয়াল' ও আর এক শ্রেণী 'বরকন্দাজ' নামে পরিচিত ছিল।লাঠিয়াল ও বরকন্দাজদের মধ্যে বিশেষ তেমন কোন পার্থক্য ছিল না দুজনকেই লাঠির উপর ভালো নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। তবে বরকন্দাজ ছিল সরকারিভাবে স্বীকৃত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সৈন্য। আবার অন্যদিকে লাঠিয়াল্ ছিল বেসরকারিএরা কিছু নগদ টাকা বা স্থাবর কিছুর বিনিময়ে জমিদার বা সমাজের উঁচু শ্রেণিরনিকটে নিজেদের লাঠি চালানোর দক্ষতা ও শারীরিক বল বিক্রি করতো। এদের কাজ ছিল শারীরিক বলের জোরে ও লাঠি চালানোর দক্ষতার ফলে আন্তঃ জামিদারি বিরোধ মিটানো এবং যেসব প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করত তাদের দমন করা,মধ্যযুগে প্রচলিত শালিসী ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি কোনো বিবাদের মীমাংসা হত না তখন শাসক এই লাঠিয়ালদের পাঠিয়ে বিচারের মীমাংসা করতেন লাঠিয়ালদের গাঁয়ের জোরে মাধ্যমে।

প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেক জমিদার ও তালুকদারেরা লাঠিয়াল বাহিনী পুষত। যে জমিদারের যত বড় লাঠিয়াল বাহিনী তার তত ক্ষমতা বেশি।"তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন ও সাহসী লোক হিসেবে লাঠি খেলা জমিদার ও কাচারির নিরাপত্তা রক্ষের কাজ করতো সরকারি কসাগরের টাকা বহনের সময় গোমাস্তাকে পাহারা দিয়েনিয়ে যেত। এই কাজের বিনিময়ে জমাদার ও মৃধাগণ সাধারণত 'চাকরন' বা কাজের পরিবর্তে জমি ভাগ দখলের অধিকার পেতো"[3]।

মধ্যযুগের এই সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সুবাদে গ্রাম গঞ্জের যুবকদের মধ্যে লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ হওয়ার চাহিদা মাথাচারাদিয়ে ওঠে।লাঠিয়াল হতে হলে তাদেরকে লাঠি খেলায় বা অস্ত্র চালানোর বিদ্যায়পটুত্ব লাভ করতে হতো। এবং একজন দক্ষ লাঠি চালক হতে হতো আর এই লাঠি চালানো ও অন্যান্য অস্ত্র চালানো শেখার জন্য তাদেরকে একজন ওস্তাদের কাছে যেতে হতো। ওস্তাদ বলতে যিনি আগে থেকে এই লাঠি খেলার মহারথী হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে ছেন। ওস্তাদদের কাজ ছিল নতুন ও যুবক ছেলেদের আত্মরক্ষা মূলক বিদ্যা ও সমস্ত প্রকার হাতিয়ার চালাতে শেখানো। ওস্তাদরা এইগুলো অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যা শেখানোর জন্য নির্দিষ্ট একটা জায়গা নির্বাচন করতেন। যার নাম দেওয়াহতো 'আখড়া' এই আখড়াই সমস্ত লাঠিয়াল দের প্রশিক্ষণ দেওয়াহতো এবং সমস্ত প্রকার হাতিয়ারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তারা একজন দক্ষ লাঠিয়াল হিসাবে সমাজে পরিচিতি লাভ করত এবং সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। এইভাবে মধ্যযুগে লাঠি খেলা এক অনন্য সামাজিক মর্যাদা লাভ করে।

আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে লাঠি খেলাবা শরীরচর্চা মূলক খেলার অবদান অনেকখানি রয়েছে। আমরা যদি ব্রিটিশ সরকার এর অধীনে ঘটে যাওয়া সমস্ত বিদ্রোহের ব্যাপারে একটুখানি খতিয়ে দেখিতা হলে দেখতে পাবো যে, বিভিন্ন উপজাতি বিদ্রোহগুলো ব্রিটিশ সরকারের শান্তি ভঙ্গ করতে একটুও কসর ছাড়েনি। সেই ছোট বড় বিদ্রোহগুলি জাতীয় বিদ্রোহের রূপ ধারণ করতে পারেনি এ কথা সত্যি তারা নিজেদের অধিকার অনেকখানি ব্রিটিশদের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছিল। আর এই সবের পিছনে আমরা বলতে পারি একজন বদ্ধতা ও

শারীরিক চর্চা অনেকখানি মদত করে ছিল।পরাধীন ভারতের বিভিন্ন বিদ্রোহে লাঠি খেলা ও শারীরিক চর্চার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি উপজাতি বিদ্রোহ এর প্রমান পাওয়া যায় ।

চোয়াড় বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্ব চলেছিল ১৭৯৮ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি। বন জঙ্গলে বসবাসকারী চোয়াড়রা প্রায় স্বাধীন ছিল। তাদের জীবনের ওপর ইংরেজ শাসনের অবিঘাত ছিল এই বিদ্রোহের কারণ।"এই চোয়াড়দের মধ্যে একাংশ জমিদারদের পাইক(লাঠিয়াল)হিসেবে কাজ করতো। নতুন ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে পাইকরা তাদের নিস্কর জমি হারিয়েছিলো"[4]।ফলেতারা দলবদ্ধভাবে লুটপাঠও হত্যা লীলা চালায় সরকার দু'বছর ধরে অভিযান চালিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে। চোয়াড়রা ছিল সরল নির্ভীক ও বিশ্বস্ত।তাই পাইকদের নিস্কর জমি ফেরত দেওয়া হয় এবং তাদের পুলিশের কাজে নিয়োগ করা হয়। ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী ছিল আধুনিক তাই যে পাইকরা পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাদেরকে আধুনিক হাতিয়ার চালাতে শিখতে হয়। এবং পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফলে যে সুযোগ-সুবিধা চোয়াড়রা পাইকরা উপভোগ করতো তা দেখে চুয়ার যুবকদের মধ্যে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী যোগ করার প্রবণতা মাথা চাড়াদিয়ে ওঠে। ফলত তাদের দমন করা অতি সহজ হয়ে যায়। এবং চোয়াড়রা যে লাঠি খেলা মূলক শরীর চর্চা মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদের মধ্যে এই লাঠি খেলার প্রবণতা আস্তে আস্তেক মতে থাকে।

এই রকম আরও বহু উদাহরণ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হলো-১৭৯৬ থেকে ১৮০৫ মালাবার বিদ্রোহ,কোচিনের ত্রিবাঙ্কুরের ভেলুথাম্পি বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৩০-৫১ মোপলা বিদ্রোহ, ১৮৬৭-৭০ গুজরাটের নাইকাদা বিদ্রোহ, ১৯০০-১৯১২ গোদাব্রিরভিল বিদ্রোহ, ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ মুন্ডা বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ,১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে, এবং আরো রম্পা বিদ্রোহ,চেঞ্চুবিদ্রোহ ইত্যাদি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ ডগমগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এই সমস্ত বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ পড়তে গিয়ে দেখতে পাবো যে বেশিরভাগই বিদ্রোহ ছিল উপজাতি, কৃষকও আদিবাসী শ্রেণীর বিদ্রোহ। তারা এই বিদ্রোহগুলিতে কোন প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করেনি, একথা বলার কোন অবকাশ রাখে না। তারা ছিল নিম্নবর্গের মানুষ তাদের আগ্নেয় অস্ত্র রাখবার মতো কোনো সক্ষমতা ছিল না। ফলতো তারা তাদের হাতের নাগালে যা পেয়েছিল তা দিয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কৃষক ও নিম্নবর্গের মানুষের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ছিল লাঠি ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত নানা অস্ত্র। এবং এইগুলি চর্চার মাধ্যমে তারা এতটা নির্ভীক ও সাহসী হয়ে উঠেছিল যে ইংরেজ সরকারের বন্ধুদের বিপরীতে লাঠি আরতির কামান ব্যবহার করে তাদের ভারত শাসন করার ভিতকে নড়বড়ে করে তুলেছিল। এর সবথেকে উপযুক্ত উদাহরণ হচ্ছে সাঁওতাল ও মুন্ডা বিদ্রোহ।

ব্যায়াম ও শরীর চর্চার মাধ্যমে বাংলার তরুণরা বৈপ্লবিক কার্যকোলাপের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে 'নবগোপাল মিত্রের' প্রতিষ্ঠিত "হিন্দুমেলা"। তিনি শংকর ঘোষ লেনে একটি আখাড়াও খোলেন। এই আখাড়ায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের ভিন্ন ভিন্ন হাতিয়ার চালানো, শারীরিক ব্যায়ামও বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শিখানো হত। হিন্দু মেলায় দেশীয় খেলাধুলাও শরীর চর্চায় যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হতো।এই মেলায় ভালো ভালো লাঠিয়ালও কুস্তিগিরদেরও আমন্ত্রণ করা হত। এখানে এসে ওই লাঠিয়ালও কুস্তিগীররা সকল প্রকার শরীরচর্চার কৌশলও বিভিন্ন হাতিয়ার চালাতে শেখাতো বাংলার যুবসমাজের তরুণদের। যাতে তারা

আগামীতে বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং ভারতবাসীর পক্ষে অবস্থান করে দেশকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে।

হিন্দু মেলার মতো আরও একটি জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিকও সন্ত্রাসী সংগঠন হচ্ছে "মিত্রর মেলা" এই মিত্র মেলা 'বিনায়ক সভাকর'এবং 'গণেশ সাভাকর' ১৮৯৯ সালে নাসিকে গোপনভাবে শুরু করেন। এই সংগঠনের হিন্দু মেলার মতো একই উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে নির্ভীক, দাম্ভিক এবং হাতিয়ার চালাতে পটু করে তোলে। এরকম আরো একটি সংগঠন হচ্ছে যেখানে অধ্যাপক মুরতাজার তত্ত্বাবধানে লাঠি ও তরবারি খেলা সেখানে হতো। যেটা সরলা ঘোষাল লেন,কলকাতার বালিগঞ্জে ব্যায়ামাগার খোলেন। অধ্যাপক মুরতাজার একজন নামকরা ছাত্র হলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন বিহারী দাস।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মীর নিসার আলী নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে, গরিব চাষী, জেলে,পটুয়া, ঢালিয়া, প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষজনকে নিয়ে তিনি নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তারা কোন আগ্নেয় অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে এই আন্দোলন করেননি বরং গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হাতিয়ার ও লাঠির ওপর আস্থা রেখে এই বিদ্রোহ ঘোষণা করে।এবং পূর্বে মীর নিসার আলী জমিদারের লাঠিয়াল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার অনুসারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলেন। "তিতুমীরের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে এক সময় ৫,০০০ এ গিয়েপৌঁছায়"[5]।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আর একজন মহান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সূর্যসেন। যিনি আমাদের কাছে মাস্টারদ্যা হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি "ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি" গঠন করেন। এই ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি সকল সদস্যকে সশস্ত্র শিক্ষা দান করেন এবং বাঙালি যুব সমাজকে প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাদান করেন।

এই লাঠি খেলায় বা শরীর চর্চায় শুধু পুরুষেরা এগিয়েছিল এমন নয়। বাংলার নারীরা পুরুষদের থেকে কোন অংশে কম যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সংঘ তৈরি করে এবং এখানে শরীর চর্চা,ব্যায়াম, মানসিকও দৈহিক বিকাশ সাধনের সব রকমের প্রস্তুতি এই সংঘে সারতেন। এই সংঘ গুলির মধ্যে অন্যতম সংঘ হল 'দিপালী সংঘ'ও 'মহিলারাষ্ট্রীয়সংঘ'।দিপালী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন লীলা নাগ রায় এবং এর অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ।এ খানে লাঠি খেলা,শরীরচর্চাও অস্ত্র চালানো শিক্ষা প্রভৃতি দান করার মাধ্যমে মেয়েদের সাহসী করে তোলা ও তাদের শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ করার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়াহতো।

দীপালি সংঘের সব থেকে অন্যতম শিষ্যা হচ্ছেন'প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার'। যিনি এই সংঘ থেকে, সবধরণের শারীরিক, মানসিক, বৈপ্লবিক, ও নানা ধরনের হাতিয়ারের প্রশিক্ষণ নেন। তার মহানত্বের ব্যাপারে আমরা প্রায় সকলে অবগত তাঁর অদম্য সাহসের কাছে ইংরেজ সরকারকে বারবার মাথানত করতে হয়েছে। তিনি ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ ,ধলঘাটের যুদ্ধ, প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এবং তিনি সংগ্রাম করার অবস্থায় মারা যান। তার এই অদম্য মানসিক বিকাশে অনেকখানি অবদান রয়েছে দিপালী সংঘের, কারণ তিনি দিপালী সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অস্ত্র চালানো শেখেন ও মানসিক ভাবে দৃঢ়হয়ে ওঠেন।

এই রকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আমাদের ইতিহাসের পাতায় চাপা পড়ে আছে। আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লাঠি খেলা বা লাঠি খেলা মূলক শরীর চর্চা আমাদের চরিত্র গঠনে যে কতখানি অবদান রাখে তা এখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

বর্তমান সমাজে লাঠি খেলার একটি ধর্মীয়উৎসব রূপে নিজের প্রয়াত দিনগুলি গুনছে। কারণ আমাদের দেশে বর্তমানে লাঠি খেলার অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যাবেযে এটি নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে ব্যর্থ হয়েছে। ও সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনীতির ঘৃণ্যতম দলদলে ডুবে যাচ্ছে। যে খেলা আমরা সকল ভারতবাসী জাতি, ধর্ম, ভেদাভেদ ভুলে খেলতাম তা আজ ধর্মীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। মুসলিমরা যেটিকে নিজের মহরমের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং হিন্দুরা যেটিকে বজরংবলী উৎসবে বা রামনবমীর মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বর্তমানে লাঠি খেলা একটি ধর্মীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধর্মীয় উৎসব ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন উপায় নেই। যখন আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে এই লাঠি খেলার গুরুত্ব হারাতে শুরু করে তখন কোন একজন ঐতিহ্য প্রেমিক মানুষ এই লাঠি খেলাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যধর্মীয় রূপ দিয়ে থাকেন। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিকে বিবেচনা করলে আমাদের কাছে লাঠি খেলার গুরুত্ব নেই বললে চলে। যদিও আজ দুই ধর্মে অনুষ্ঠানে এই খেলাটি বেঁচে আছে। মুসলিমদের শেষ নবী ‘হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুতা’আলা আলাইহিওয়াসাল্লাম’ এর নাতি ‘হোসাইন রাজিয়াল্লাহুতা ‘আলাআনহু’ “ইসলামিক পঞ্জিকা অনুসারে ১০ মুহাররম ৬১ হিজরীবা ১০ অক্টোবর ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ বর্তমান ইরাকের কারবালা নামক প্রান্তরে উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন।ফলত মুসলিমদের কাছে কারবালার যুদ্ধের দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তারা ইসলামিক পঞ্জিকা অনুসারে মহরম মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ অব্দি এই যুদ্ধের অনুকরণ করে লাঠি খেলার মাধ্যমে। যেটা শুধু ভারতবর্ষে কিছু কিছু জায়গায় প্রচলিত। নতুবা অন্য কোন মুসলিম দেশে মহরম মাসে কোন রকম লাঠি খেলার প্রচলন নেই।এখান থেকে আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি যে লাঠি খেলার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহরম মাসের এই লাঠি খেলার আয়োজন করা হয়।

হিন্দুদের ভগবান ‘শ্রীরাম’ এর জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় রামনবমী। হিন্দুদের ভগবান শ্রীরাম এর স্ত্রীকে লঙ্কাপতি রাবণ অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। তাই রাম ও তার ভাই লক্ষণ এবং বানর সেনা, রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে শ্রীরামের জয়হয়। এবং এই যুদ্ধে জয়ীহওয়ার ঘটনাকে অনুকরণ করে বা চিরস্মরণীয় করে রাখতে হিন্দুরা রাম নবমীতে লাঠি খেলার প্রদর্শন করে থাকেন। যদিও তাদের কোন ধর্মগ্রন্থে এরকম লাঠি খেলার কোন উপদেশ নেই। তাই এই বিষয়ে বলতে পারি যে ভারতের এই ঐতিহ্যমূলক খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে ঐতিহ্য প্রেমী মানুষেরা এর ধর্মীয় খেলার রূপ দেন।

বর্তমানে আমাদের এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারকে যত সম্ভব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।ধর্মীয় ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে আনা হয় এবং এই লাঠি খেলার ব্যবহার যেন জন চেতনার উন্মেষ জাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এবং পুরুষ ভিত্তিক ধর্মে অনুষ্ঠান থেকে সরে গিয়ে যদি নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করে সকলকে এই খেলা শেখানো হয়, তাহলে যে বর্তমানে নারীদের দুরবস্থা তা দূর করা সম্ভব হবে। নারীদের মানসিক ও শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ করে তুলাহলে, তারা নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারবে। এবং আবার সেই প্রীতিলতা, লীনা নাগ, কল্পনা দত্তের, মত নারী তৈরি হবে আমাদের এই সমাজে। এবং তখন আর নারীকে বাড়ি থেকে বেড়াতে গেলে দুশ্চিন্তার স্বীকার হতে হবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে।